মানব সভ্যতাকে জানার জন্য ছবি হল সবচেয়ে সহজ মাধ্যম

মৃণাল ঘোষ। বিশিষ্ট এই চিত্র-সমালোচকের জন্মদিন ১০ই নভেম্বর। এবছর সত্তর বছর পূর্ণ করছেন তিনি। এই উপলক্ষ্যে উদ্ভাসের বিশেষ সাক্ষাৎকার। মৃণাল ঘোষের মুখোমুখি আলোচনায় উঠে আসছে তাঁর ছবির দুনিয়াতে পা রাখা, বাঙালির ছবি-জীবন এবং চিত্রকলার জগৎ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

আপনার ছোটবেলার কথা দিয়ে শুরু হোক আমাদের আলোচনা। আপনার শৈশবের স্মৃতিকথা শুনতে ইচ্ছে করছে।

আমার জন্ম এখনকার বাংলাদেশে, তখনকার পূর্ববঙ্গে। আমি জন্মেছিলাম ১৯৪৪ সালের ১০ই নভেম্বর। বরিশাল জেলার উত্তর সাহাজপুরের উলানিয়া বলে একটি গ্রামে আমার জন্ম। ওখানকার স্মৃতি আমার খুব অল্প মনে আছে। কারণ আমি ওখান থেকে চলে আসি ১৯৫০ সালে, তখন আমার পাঁচ-ছয় বছর বয়স। সেই ক্ষীণ স্মৃতির কথা আমি লিখেছি ‘ছেড়ে আসা মাটি’ নামে একটি লেখায়, সেটি প্রকাশিতও হয়েছে অভিযান পাবলিকেশন থেকে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়, আমাদের কাছে স্বাধীনতার চেয়েও দেশভাগটা অনেক বড় ছিল। কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আমাদেরকে বিপর্যস্ত

করে ফেলে। যদিও দেশভাগের পরবর্তী দু-তিনবছর পর্যন্ত আমার বাবা-দাদু ভারতে চলে আসার কোনও পরিকল্পনা করেননি। কারণ এখানে এসে আমরা কি করব? সবই তো ওখানে। আমার দাদু ডাক্তার ছিলেন, আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, তাঁর একটা দোকান ছিল। এছাড়া ছিল কিছু জায়গা জমি। তার থেকে আমাদের আয় হত।

তাহলে ভারতে চলে আসার ঘটনাটা কীভাবে ঘটল?

সে কথাটাই বলি। আমাদের ছিল যৌথ পরিবার, পরে সব ভাগ হয়ে দূরে সরে যায়। প্রায় সকলেই চাকরি সূত্রে বা অন্যান্য কারণে এদিকে ওদিকে চলে যায়। শুধু আমাদের পরিবারটাই ওখানে ছিল। তখন ওখানকার স্থানীয় মুসলমানরা চাইত এখান থেকে ওরা সব চলে যাক, এদের জায়গা, বাড়িঘর আমরা সব দখল করি। এই ছিল তখনকার প্রবণতা। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। আমি তখন খুবই ছোটো, রাত্তিরে ঘুমিয়ে আছি। একটা বড় খাট ছিল, তাতে আমরা সব ভাইবোন আর ঠাকমা শুয়েছিলাম। আর আমার মা তখন আমাদের সবচেয়ে ছোটো ভাইকে নিয়ে পাশের খাটে শুয়ে। তার তখন তিনচারমাস বয়স। হঠাৎ বাইরে থেকে টর্চের আলো, প্রচুর লোকজন এবং 'ডাক্তারবাবু' 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকাডাকি। দাদু ভাবলেন নিশ্চয়ই কোনও পেশেন্টের বাড়ির লোকজন এসেছে বিপদে পড়ে। দাদু ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতেই, না বোধহয় তার আগেই ওরা বাইরে থেকে ধাক্কা মেরে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দাদুকে ব্যাটনের বাড়ি মারে। তারপর বাড়ি আলমারি-সিন্দুকের চাবি চায়, না দিলে বাচ্চাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়।

রীতিমতো ডাকাতির ঘটনা!

হ্যাঁ, ওদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ভয় দেখানো। সেই ঘটনার পরে আর ওখানে থাকা নিরাপদ বলে মনে হল না। আমার দাদুর এক ভাই এখানে এই সোদপুরে থাকতেন। আমরা সেই রাঙাদাদুর কাছে এসে উঠলাম প্রথমে। এই অঞ্চলটার নাম হল বার্মা শেল, পুরো পাড়াটার নাম অবশ্য দক্ষিণপল্লি। এই দাদুই আমাদের জন্য এখানে একটা জায়গা কিনে দিয়েছিলেন। সেখানেই আমাদের নিজেদের বাড়ি হয়। ১৯৫১ সাল থেকে আমরা সেই বাড়িতেই আছি। খুব সম্প্রতি অবশ্য এই ফ্ল্যাটে এসেছি।

আপনার পড়াশুনোর কথা একটু বলুন।

আমার পড়াশুনোর শুরু হয়েছিল ওখানেই। এক মাস্টারমশাই আসতেন বাড়িতে, আমি তাঁকে পণ্ডিতমশাই বলতাম। তারপর সোদপুরে চলে আসার পর এখানে পাড়াতে একটা পাঠশালা মতো ছিল, সেখানে পড়তাম। একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে প্রাইভেটেও পড়তাম। আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি একবারে ক্লাশ ফাইভে, সোদপুর হাইস্কুলে।

তার পরবর্তীতে?

আমি স্কুল ফাইনাল পাশ করি ১৯৬০-এ। এ প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, সোদপুর হাইস্কুলে ক্লাশ সেভেনে আমার রেজাল্ট একটু খারাপ হওয়াতে আমাকে রহড়াতে কল্যাণনগর হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে আমি ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়ি। তারপর প্রি-ইউনিভার্সিটি সায়েন্স নিয়ে আমি ভর্তি হই সেন্ট পলস্ কলেজে। সায়েন্স নেবার কারণ ছিল ভবিষ্যৎ-জীবিকা। অন্তত আমার বাড়ির লোকেরা সেইরকম ভেবেছিলেন। আমরা ছিলাম প্রি-ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ব্যাচ। তারপরে আমার ইচ্ছে ছিল ফিজিক্স অনার্স পড়ার। কিন্তু আমার দাদু চেয়েছিলেন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। সুতরাং আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পড়ি। যদিও এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমার একেবারেই ভালো লাগত না। আমি সেইজন্য একটু খারাপ করেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন কোথায়?

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে। সেখানে আমার পক্ষে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটু অতিরিক্তই পরিশ্রমসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ওখানে শারীরিক পরিশ্রম করতে হত। কলেজে আমাদের কাঠ কাটতে হত, লোহা গরম করে জিনিস তৈরি করতে হত। আমার তত শারীরিক শক্তি ছিল না। খুব কষ্ট পেতাম। তখনই আমি বুঝি সায়েন্স বা ম্যাথমেটিকস্ কোনওটাই আমার সাবজেক্ট নয়। যদিও পড়াশোনাটা ওখানে আমি মন দিয়েই করেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনও মানসিক যোগ ছিল না। তার ফলে পাশ করলেও আমার রেজাল্ট খুব একটা ভালো হয়নি। আমার ভয় ছিল একটাই। আমার তো ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি ভালোবাসা ছিল না, কিন্তু সেটা না থাকলে আমি চাকরি করবো কি করে? পড়াশোনা শেষ করে অনেক জায়গায় আমি ইন্টারভিউও

দিই। তারপরে ইছাপুরে রাইফেলস্ ফ্যাক্টরির ভেতরেই একটা অফিস ছিল কন্ট্রোলারেট অফ কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স নামে, আমি সেখানে চাকরি পাই। ডিফেন্স-এর যে প্রোডাক্ট তার কোয়ালিটি যাচাই করাটাই ছিল এই সেকশনের কাজ।

এই চাকরিতে আপনি ঢোকেন কত সালে?

১৯৬৫-তে। তারিখটা ছিল নভেম্বরের ২৫।

আর আপনি কি শেষ পর্যন্ত ওই চাকরিতেই ছিলেন?

হ্যাঁ, আমি আগাগোড়া ওখানেই ছিলাম। আমার রিটায়ারমেন্ট ছিল ২০০৪-এ, কিন্তু আমি ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিই ১৯৯৬-তে।

তাড়াতাড়ি অবসর কি কোনও শারীরিক কারণে?

প্রধান কারণ যেটা ছিল, সেটা হল বদলিকে অ্যাভয়েড করা। যতদিন পেরেছি আমি প্রমোশনকে এড়িয়ে গিয়ে একই অফিসে থেকেছি। শেষে যখন বাধ্যতামূলকভাবে আমার বদলির অর্ডার এল তখন আমি চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার বদলি হয়ত হত দিল্লিতে হেড-কোয়ার্টারে। কিন্তু অন্য আর একজনের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে আমাকে শেষপর্যন্ত হায়দ্রাবাদে যাবার কথা বলা হয়। তখন আমি স্বেচ্ছাবসর নিই। এরমধ্যে আমি লেখালিখির জগতে পুরোটাই ঢুকে গেছি।

এবারে আমরা আপনার শিল্পচর্চা বা লেখালেখির বিষয়ে আসব। সবার প্রথমে জিজ্ঞেস করি আপনার লেখালিখির শুরু কবে থেকে?

আমি লেখালিখি করবো এটা আমার স্বপ্নেও ছিল না। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি একটা আগ্রহ বরাবরই ছিল। চাকরি পাবার আগে আমি টিউশানি করতাম, তার টাকা বাঁচিয়ে তখন থেকেই আমি কিছু কিছু বই কিনতাম। সাহিত্যকেন্দ্রিক, কবিতার বই বেশি কিনতাম। চাকরি পাবার পর বইকেনাটা আমার নিয়মিত কাজ হয়ে গেল। সে সময়ই

আমি ঠিক করলাম আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করবো, প্রাইভেটে আমি বি.এ. পাশও করলাম চাকরি করতে করতেই। এম.এ.-টাও দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তখনও আমার মনে লেখার পরিকল্পনা আসেনি। পড়াশোনা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে আমি শিল্পকলার দিকে চলে গেলাম। আমার এক বন্ধু ছিল নভেন্দু সেন, সে ছবি আঁকতো। পরে সে একজন ভালো শিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। সে আর এখন আমাদের মধ্যে নেই। তা সে যাইহোক, নভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে শিল্পকলার প্রতি আমার আগ্রহটা আরো বেশি করে এল। একটা সময় আমার মনে হল যে এই জায়গাটায় যদি আমি ঢুকতে পারি, জানতে পারি তাহলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসটাকে আমি পুরোপুরি জানতে পারবো। তখন এমনও দিন গেছে চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে আমি ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করেছি, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গেছি।

আর ছবির প্রদর্শনী দেখা?

এই অভ্যেসটা আমার ছিলই।

এটা ঠিক কোন সময় থেকে আপনি নিয়মিতভাবে করছেন?

চাকরি পাবার পর থেকেই। মোটামুটিভাবে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে শুরু।

আর আপনার প্রথম লেখাটা বেরোলো কবে? কীভাবে?

১৯৫৩ সালে সোদপুরে এই পাড়াতেই আমরা একটা 'সাধারণ পাঠাগার' নামে লাইব্রেরি করেছিলাম। সেই লাইব্রেরিরই পত্রিকা 'নবাঙ্কুর'-এ আমি প্রথম লিখি। যতদূর মনে পড়ছে সেটা ছিল একটা রম্যরচনা জাতীয় লেখা। তবে শিল্পকলা সম্পর্কিত লেখা নয়। নবাঙ্কুর-এ কয়েকটি লেখা বেরোনোর পর দীর্ঘদিন আমি কিছু লিখিনি। শুধু ছবি-ভাস্কর্য দেখি, বই পড়ি আর চাকরি করি। শিল্পকলা নিয়ে আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় নীহারেন্দু দত্ত-এর মাধ্যমে। তিনি ছবি আঁকতেন। তখন বিদেশি শিল্পীদের কাজ নিয়ে একটা প্রদর্শনী হচ্ছিল। উনি আমাকে বলেছিলেন সেটা দেখে আমি যদি কিছু লিখি, তাহলে উনি সেটা পড়ে প্রদর্শনী না দেখার আক্ষেপটা দূর করতে পারেন। কোনও

কারণে তাঁর পক্ষে তখন সেই প্রদর্শনীটি দেখা সম্ভব ছিল না। তখন বারোমাস বলে একটি পত্রিকা ছিল।

বারোমাস মানে এখনও যে বারোমাস আমরা পড়ি সেই পত্রিকাটি?

হ্যাঁ, সেটাই। আমার ওই লেখাটি বারোমাস পত্রিকায় ছেপে বেরোয় ১৯৮২ সালের মে সংখ্যায়। সেই সময় আমার মনে হয়েছিল আমাদের আর্টে একটা ডাইভার্সিটি যেমন আছে, তেমনি একটা ডিসিপ্লিনও কোথাও আছে। সেইটাকে আমার খুঁজে বের করা দরকার। সেইটা খোঁজার জন্যই আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটা পরিচয়ে দেবেশ রায় ছেপেছিলেন। তখন দেবেশদা পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

এটা কোন সালে ছাপা হয়?

এই লেখাটিও ১৯৮২-তেই প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ওই লেখাটিকে আমার আরো বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল। এবং সেই লেখার পরবর্তী অংশগুলিও পরিচয়ে পরপর ছাপা হয়। এই লেখাগুলি নিয়েই আমার প্রথম বই বেরোয়।

কত সালে বেরিয়েছিল আপনার প্রথম বই? প্রকাশক কে ছিলেন?

বইটা বেরিয়েছিল ১৯৮৯ সালে, পত্রিকায় প্রকাশের বেশ কয়েকবছর পরে। প্রকাশক ছিল প্রতিক্ষণ।

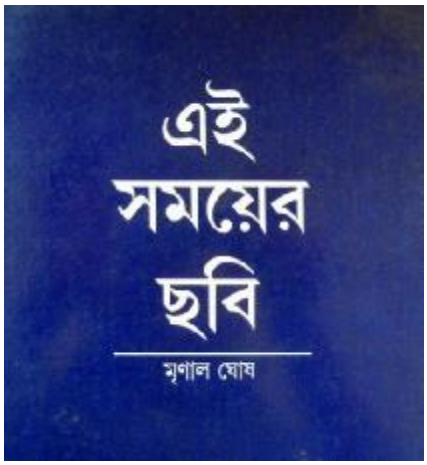

প্রতিক্ষণ তো তখন পত্রিকা হিসেবেও বেরোতো?

হ্যাঁ, তখন তাঁর সম্পাদক ছিলেন অরুন সেন, দেবেশ রায়ও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। তাঁরা দুজনেই আমাকে প্রতিক্ষণে লিখতে বলেন। খুব সম্ভবত দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আমি প্রতিক্ষণে নিয়মিত লিখতে শুরু করি। ওখানে প্রদর্শনীর রিভিউ বেরোতো, আর সেগুলো বেশ বড় আকারেই বেরোতো। আমি তখন রিভিউ আর প্রবন্ধ দুই লিখতাম সেখানে।

আমার প্রথম বই ‘এই সময়ের ছবি’। দ্বিতীয় বই ‘গণেশ পাইনের ছবি’ – সেটা আমি নিজের উদ্যোগেই লিখি।

ওটা একেবারে সরাসরি বই আকারেই তো বেরিয়েছিল বোধহয়?

হ্যাঁ, ওই লেখাটা একেবারে বই হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় যে বই 'সমকালীন ভাস্কর্য' সেটার লেখাগুলো প্রতিক্ষণ-এ বেরিয়েছিল। এক একটা প্রবন্ধ লিখতাম প্রতিক্ষণের জন্য, পরে সেগুলো বইয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। এই হল আমার লেখালিখির শুরুর কথা।

আচ্ছা, আপনি নিজে তো কখনও ছবি আঁকেননি। বাড়িতেও সরাসরি কোনও শিল্পীর সান্নিধ্য পাননি। লেখালিখি করতে গিয়ে শিল্পকলার টেকনিক্যাল দিকগুলো কীভাবে সামলাতেন? সেগুলো ভাষায় প্রকাশ করতেন?

আমি ছবি নিয়ে লেখার আগেই প্রায় দশ-পনেরো বছর ধরে পড়াশোনা করেছি। প্রদর্শনীতে কাজ দেখেছি খুব মন দিয়ে। নভেন্দুর মতো শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও হত নানারকম। আর্ট কলেজেও যাতায়াত ছিল আমার, সেখানে শিল্পীদের কাছ থেকে দেখতাম। যদিও টেকনিক সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার প্রথমদিকে নিশ্চয়ই ছিল না। তবে নিয়মিত দেখতে দেখতে, কিংবা আর্ট ওয়র্কশপগুলোতে গিয়ে ক্রমে আমার সেসব সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ছবি আঁকার পদ্ধতি-প্রকরণগুলো জেনে বুঝে যাই।

আপনি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে একজন অত্যন্ত সুপরিচিত শিল্পকলা-সমালোচক। একজন পেশাদার সমালোচক হিসেবে আপনাকে সমাজের মানুষেরা, আপনার চেনা প্রতিবেশিরা কি চোখে দেখেন বলে আপনার ধারণা?

দেখুন, আমি ঠিক সেই অর্থে নিজেকে পেশাদার শিল্প-সমালোচক বলে মনে করি না। আমার লেখার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিজে কিছু শেখা। এই যে বইটই যা কিছু লিখেছি সবই নিজে কিছু শিখব বলে লিখেছি। এগুলো কে পড়ল না পড়ল সে নিয়ে আমি ভাবি না। চারপাশের মানুষ অনেকে জানে আনন্দবাজারে প্রতি সপ্তাহে আমার একটা লেখা বেরোয়। কিন্তু বেশিরভাগই খুব একটা আগ্রহী নয় এ ব্যাপারে।

আশপাশের কারোর মধ্যে তেমন কোনও সচেতনতা বা কৌতূহল দেখেন না? বা কোনওরকম জিজ্ঞাসা?

এমনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে কোনও কৌতূহল দেখিনি। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটা গোষ্ঠী বা দল, যেমন এখানে একটা নাটকের গ্রুপ তাঁরা একটা আর্ট গ্যালারি করেছেন 'জলসাঘর' নামে। এঁদের মতো কেউ কেউ হয়তো আমাকে ডাকেন। তাঁরা আমার লেখালিখি সম্পর্কে আগ্রহ দেখান। এরকমভাবেই হঠাৎ করে আমি কাউকে আবিষ্কার করে ফেলি। যেমন এই তো কিছুদিন আগে কলাণীতে আমার এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিলাম। ওখানে যাবার পর তাঁদের পাশের বাড়িতে গিয়ে শুনি তাঁরা নাকি আমার সম্পর্কে খুব আগ্রহী। সেই বাড়ির যিনি গৃহবধূ, তিনি তো আমাকে দেখে খুব আপ্লুত। বললেন – 'আপনিই সেই মৃণাল ঘোষ!' তিনি আমার অটোগ্রাফ নিলেন। এইরকম কিছু মানুষও আছেন।

আমাদের দেশে ছবি দেখা বা ভাস্কর্য দেখে আনন্দ পাওয়া – এই ব্যাপারটা বড় বেশি উপেক্ষিত। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? আপনার কীরকম অভিজ্ঞতা?

আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ভিশ্যুয়াল আর্টের যে কালচারটা, সেটা একেবারে নেই। একেবারে গ্রামীণস্তরে লোকশিল্পী যাঁরা, তাঁদের সমাজে সেই চর্চাটা কিন্তু আছে। কিন্তু শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই চর্চা একেবারে নেই। তাঁরা হয়তো সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহী, কিছুটা সমাজ-ভাবনা, রাজনীতি নিয়েও চর্চা করেন। কিন্তু শিল্পকলা নিয়ে তাঁরা একেবারেই আগ্রহ দেখান না। খুব ধনী যাঁরা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বিষয়টা একটু ভালোবাসেন, ছবি কেনেনও। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন।

আপনি তাহলে তো লেখক হিসেবেও খানিকটা সংকটের জায়গায় তাই না?

নিশ্চয়ই। শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক উভয়েই এই সংকটের শিকার।

ছবির সম্পর্কে সমাজের এই যে উদাসীনতা – এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শিল্পীরা কি খুব সচেষ্ট? নাকি আপনি মনে করেন সমাজের অন্য কোনও শক্তি এই সমস্যার সমাধান করবে?

শিল্পীরা কিন্তু অনেক চেষ্টা করেছেন। অনেক আন্দোলন হয়েছে যাতে ছবির প্রচার হয়, মানুষ আগ্রহী হন। আবার অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে অল্পস্বল্প প্রচেষ্টাও হয়েছে। এর ফলে কিছু মানুষ হয়তো প্রভাবিত হয়েছেন। দর্শক সংখ্যা হয়তো

খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ সেভাবে সামিল হয়নি। জনসাধারণ ছবির দিকে এগিয়ে আসেনি।

আপনার কি মনে হয় স্কুল-লেভেলে আর্ট-অ্যাপ্রিশিয়েশন কোর্স চালু করা দরকার? শুধু ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া শেখা নয় সেগুলোকে দেখতে শেখাটাও তো প্রয়োজন।

হ্যাঁ, সেটা হলে তো ভালো হয়। একটা প্রয়াসও হয়েছিল। এখন বোধহয় হায়ার সেকেন্ডারি স্টেজে হিস্ট্রি অফ আর্টের একটা কোর্স নতুন করে চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে যোগেন চৌধুরী আমাকে বলেছেন একটা টেক্সট্ বই লিখে দেবার জন্য। কিন্তু সেটা এখনও পর্যন্ত মেটেরিয়ালাইজ করেনি। পরবর্তী সময়ে আমার মনে হয়েছে যে এটা নিয়ে একটা আলাদা বই লেখা যায়, যাতে হায়ার সেকেন্ডারি ও আর্ট কলেজের গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের কোর্স দুটোকেই কভার করা যাবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি নিজে থেকে একটা কাজও শুরু করেছি। গত আট-নমাস ধরে সেটাই করছি। বিশ্বশিল্পের ইতিহাস বলে একটি বইয়ের পরিকল্পনা আছে আমার। ওয়েস্টার্ন পার্ট-টা প্রায় শেষ করে এনেছি। এখন ইন্ডিয়ান পার্ট-টা বাকি।

আপনি তো বিগত দিনের শিল্পীদের কাজের সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত। আবার একেবারে আধুনিক প্রজন্মের শিল্পীদের কাজও দেখছেন। দুই প্রজন্মের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কি পার্থক্য আপনার নজরে পড়েছে?

পরিবর্তন তো নজরে আসেই। এটা হয়েছে ছবির জগতের পরিবর্তনের ফলে এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলেও। এখনকার শিল্পীদের দুটো ট্রেন্ড। একটা ট্রেন্ড, আমাদের সাধারণ আধুনিক শিল্পকলার যে বিবর্তন সেই ধারাতেই কাজ করছেন অনেকে। আর কিছু তরুণ শিল্পী নতুন কিছু কাজ করার চেষ্টা করছেন, যেটা কিনা

পশ্চিমের দেশ থেকে এসেছে, পোস্টমডার্ন ভাবনা খানিকটা। সেটাকে অল্টারনেটিভ আর্ট বলা হয় বা বিকল্প রূপকল্প বলতে পারি। তারা মনে করেছেন এটাই একমাত্র এখনকার শিল্পীদের চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্র, পুরোনো ধারণায় কাজ করে কোনও লাভ নেই।

তাতে কি আপনার মনে হয় বাংলার শিল্পীদের আলাদা করে নতুন কোনও চিত্রভাষা গড়ে উঠছে?

সেখানে আর বাংলার নতুন চিত্রভাষা বলে কিছু নেই। একটা আন্তর্জাতিক ভাষা চলে এসেছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তারমধ্যে একটা ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ তো ঘটছেই।

আপনার কি মনে হয় এখনকার শিল্পীরা একটু বেশি অর্থমুখী? অর্থমুখীনতা তাঁদের শিল্পকে কি কোথাও অধোগামী করে দিচ্ছে?

সেটা তো আছেই। আর তার ফলে ক্ষতিও হচ্ছে। আগেকার শিল্পীরা ছবি আঁকাটাকে যেমন জীবনচর্যার ভেতরে এনে ফেলেছিলেন। তাঁরা ভালোবেসে ছবি আঁকার চর্চা করতেন এবং সেভাবেই একদিন একটা জায়গায় এসে পৌঁছতেন। এখন কিন্তু আর্ট কলেজে পড়তে পড়তেই শিক্ষার্থীরা একজিবিশন করে ফেলে। ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরাও সোলো একজিবিশন করে। এরা অনেক বেশি পেশাদার হয়ে গেছে।

তাতে কি কাজের ক্ষেত্রে গুনমান কিছু বেড়েছে?

আমার তো মনে হয় না। শিল্পের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে কিছু করে ফেলা যায় না। এরজন্য দীর্ঘদিনের অনুশীলন দরকার।

আমাদের দেশজুড়ে এখন নানারকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংকট ও দুর্নীতি চলছে। আর তার মধ্যে কিছু শিল্পীর নামও জড়িয়ে যাচ্ছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর ছবি জাল করা অথবা নানারকম অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত হয়ে পড়া। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

১৯৯০-এর দশকের পর থেকে যে দুটো জিনিস ঘটল সেটা হল ইকোনমিক গ্লোবালাইজেশন এবং একটা পোস্টমডার্ন ট্রেন্ড। গ্লোবালাইজেশন কিন্তু মানুষের

আকাঙ্খাটাকে অনেক বাড়িয়ে দিল। সকলেই যেন সহজে টাকা রোজগারের ধান্ধায় মেতে উঠল। ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যে কোনও কারনেই হোক ছবির বাজার অনেকটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল। সেটা শিল্পীদের মধ্যে একটা উচ্চাশা জাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাজার তো তেমন থাকল না, পড়ে গেল। অথচ শিল্পীদের উচ্চাশাটা রয়েই গেল। আর তখন দুর্নীতি এসে তাদের গ্রাস করল। আমাদের এখানে ছবি কপি করার ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে নিয়মিত জাল ছবি তৈরি করা হয়। সেগুলো বিক্রিও করা হয় চড়া দামে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যে কপি সেটাও এই জাতীয় কোনও চক্রেরই কাজ। আসলে উচ্চাকাঙ্খাটা একটা এমন জায়গায় চলে গেছে যে সেখানে আর কোনও নীতি-টিতি নেই। অনেক নামী শিল্পীরাও এর মধ্যে ঢুকে গেছেন। এটা খুব একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি।

বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনায়ক ছবি এঁকেছেন। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ছবি আঁকেন। তাঁর ছবি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

তাঁর আঁকা ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে যে একটা মানুষ অত কাজ করেও কি করে এত ছবি আঁকেন? ওঁর লাইনে একটা স্যুইফ্টনেস আছে। কিন্তু নিয়মিত চর্চা না হলে যা হয়। সেই ইসথেটিক্সটা উনি এখনও পাননি। একটা কুইক স্ট্রোকে উনি কাজ করেন, ওঁর চরিত্রের টেম্পারামেন্টের একটা প্রতিফলন ওঁর কাজে দেখা যায়। কিন্তু একটা ছবিকে ছবি করে তোলার জন্য যে ধ্যান দরকার, যে মগ্নতা দরকার সেটা স্বাভাবিকভাবেই উনি পান না। ফলে শেষ অব্দি উনি আর ছবিটাকে ছবির জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন না।

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই ছবি আঁকতে পারেন না, মূর্তি গড়তে পারেন না, এমনকি তাঁরা এসব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করেন না। এখন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি, কেন মানুষ শিল্পকে ভালোবাসবে? কিসের টানে এর কাছে আসবে? সাধারণ মানুষের কাছে শিল্পের প্রয়োজনটা ঠিক কোথায়?

আমি নিজে শিল্পের কাছে যে কারণে এসেছিলাম সেটার কথাই বলি। আমার মনে হয়েছিল শিল্পকলা এমন একটা জিনিস যার মধ্যে থেকে মানুষের সংস্কৃতিচর্চা এবং জীবনচর্যার পুরো ইতিহাসটাকে পাওয়া যায়। এই জিনিসটাকে যদি কেউ জানতে

আগ্রহী হয় তাহলে কিন্তু তাঁর কাছে ছবি দেখাটা অনিবার্য। ছবি যে দেখে না সে কিন্তু মানুষের সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকে কখনও বুঝবে না। ছবির মধ্যে মানুষের পুরো সংস্কৃতির ইতিহাসটা লুকিয়ে থাকে। আমরা ছবি দেখতে দেখতে সেটাকে আবিষ্কার করতে পারি। এই জন্যেই ছবি দেখা দরকার, তাকে চর্চার দরকার। কিন্তু সেই সচেতনতা কজনের মধ্যে আছে? কেউ বোঝেন না, জানেন না। অথচ মানবসভ্যতাকে জানার জন্য ছবি হল সবচেয়ে সহজ মাধ্যম, সুন্দরতম উপায়।

শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা ও লেখালিখির বাইরে আপনার প্রিয় কাজ কি?

আমার কোনও অ্যাম্বিশন নেই। বেঁচে থাকাটাই হল সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। তবে শখের কথা বললে গান শোনাটা আমার বহুদিনের প্রিয় একটা বিষয়। একটা সময় আমি গান শিখতে চেষ্টা করেছিলাম, সংগীতের গ্রামারটা জানার জন্য। সেতারও শিখেছিলাম। থার্ড ইয়ার অব্দি পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। এছাড়া আর কি বলব? প্রতিনিয়ত আনন্দ পাওয়া। একটা ফুল দেখেও আমি আনন্দ পাই। একটা ফুলের ফুটে ওঠা, একটা পাতার ঝরে পড়া এগুলো আমাকে ভীষণরকম স্টিমুলেট করে।

আর আপনার কবিতা? আপনি তো কবিতাও লেখেন, আপনার বইও আছে।

হ্যাঁ, কবিতায় আমার পুরো জীবনটাই উঠে আসে। আমি যেভাবে জীবনটাকে দেখছি, অনুভব করছি সেটাই কবিতায় লিখি।